بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) আজ ২১শে মে, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা জারি রাখেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল; তিনি যেসব যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন সেগুলোর বিষয়ে কিছু বর্ণনা করছি। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন; এছাড়া তিনি বিভিন্ন সারিয়্যাতেও অংশগ্রহণ করেন, যেগুলোর কোন কোনটিতে তিনি নেতৃত্বও দেন। সারিয়্যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রেরিত এমন যুদ্ধাভিযান যেখানে তিনি (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন নি। বদরের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করার সময় সাহাবীদের কাছে মাত্র ৭০টি উট ছিল, যে কারণে প্রতি উটের জন্য তিনজন আরোহী নির্ধারণ করা হয়। হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একই উটে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের সিরিয়া-ফেরত কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য সাহাবীদের নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি (সা.) সংবাদ পান যে, কুরাইশরা তাদের বাণিজ্য-কাফেলার সুরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে মক্কা থেকে আসন্ন সৈন্যবাহিনীর বিষয়ে অবগত করেন এবং পরামর্শ আহ্বান করেন যে, তারা কোন দলটির মোকাবিলা করতে চান। একদল মক্কা থেকে আগত সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে বাণিজ্য-কাফেলার সাথে লড়াই করাকেই সমীচীন বলে পরামর্শ দেন; আরেকদল বলেন, তারা সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে আসেন নি, বরং বাণিজ্য-কাফেলার মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাদের এরূপ পরামর্শ শুনে মহানবী (সা.)-এর চেহারার রং বদলে যায়, অর্থাৎ তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন। হযরত আবু আইয়্যুব (রা.)'র মতে পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের ৬নং আয়াত كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ এ উপলক্ষ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, **যেভাবে তোমার প্রভু তোমাকে এক পুণ্য উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে বের করেছিলেন, অথচ মু'মিনদের একদল একে অবশ্যই অপছন্দ করছিল।** তখন হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়ান এবং সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করার সপক্ষে সুন্দর বক্তব্য রাখেন, তারপর হযরত উমর (রা.)ও দাঁড়িয়ে সুন্দর বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)ও অত্যন্ত জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন এবং মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **"হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে যেদিকে নির্দেশ দিয়েছেন সেদিকে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহ্‌র কসম! বনী ইসরাঈল মূসাকে যেরূপ বলেছিল যে, 'তুমি আর তোমার প্রভু যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকব'— আমরা কখনোই আপনাকে সেরূপ বলব না! যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ আছে আমরা আপনার সহযোদ্ধা হয়ে লড়াই করব!"**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র সাথে পরামর্শ করেন যে, এদের বিষয়ে তাদের অভিমত কী। আবু বকর (রা.) বলেন, **'তারা আমাদের জ্ঞাতিভাই ও আত্মীয়। আমার মনে হয় আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন, তা কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি যোগাবে। আর আশা করা যায় যে, আল্লাহ্**

তা'লা অচিরেই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সুমতি দিবেন।' মহানবী (সা.) যখন হযরত উমর (রা.)'র মতামত জানতে চান তখন তিনি (রা.) আবু বকর (রা.)'র মতের বিরোধিতা করে বলেন, 'আমার অভিমত হল, তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা তাদের শিরোচ্ছেদ করব।' তিনি বন্দীদেরকে তাদের নিকটতম মুসলিম আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে বলেন যেন মুসলমানরা তাদের কাফির আত্মীয়দের নিজ হাতে হত্যা করে। কিন্তু মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ বেশি পছন্দ করেন। পরদিন হযরত উমর (রা.) গিয়ে দেখেন মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) বসে কাঁদছেন। হযরত উমর (রা.) কান্নার কারণ জানতে চাইলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হযরত আবু বকর তাদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-কে জানানো হয়েছে যে, তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি অত্যন্ত সন্নিকটে। আর আল্লাহ্ তা'লা এই প্রসঙ্গে সূরা আনফালের ৬৮-৭০নং আয়াত নাযিল করেছেন। ৬৮নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'কোন নবীর জন্য এটি সমীচীন নয় যে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াই সে যুদ্ধবন্দী রাখবে।'** হুযূর (আই.) বলেন, এটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস; কিন্তু এর প্রথমদিকের বর্ণনার শেষে বর্ণিত আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে মিলে না, বরং বিষয়টিকে একটু দুর্বোধ্য করে তোলে। এই বর্ণনাটিকে সঠিক গণ্য করে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও তফসীরকারকগণ এই অভিমত প্রদান করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বদরের যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রা.)'র সিদ্ধান্ত পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা আসলে ভুল, আর এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে মূলত অহেতুক হযরত উমর (রা.)'র মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে। হুযূর (আই.) এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর অপ্রকাশিত তফসীরের নোটসমূহ থেকে একটি নোটের উদ্ধৃতি প্রদান করেন যেখানে এই ভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, ইসলামপূর্ব আরবে এবং দুঃখজনকভাবে বর্তমানেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, যুদ্ধ ছাড়াই মানুষকে বন্দী করা হয় এবং তাদেরকে দাস বানানো হয়। এই আয়াতে সেই জঘন্য রীতিকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেবলমাত্র যুদ্ধ-পরিস্থিতিতেই এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরই শত্রুপক্ষের কাউকে যুদ্ধবন্দী করা যাবে; যদি যুদ্ধ না হয় তবে কাউকে বন্দী করা বৈধ নয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই আয়াতটির অনেক ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর সে প্রসঙ্গে তিনি (রা.) উপরোক্ত ঘটনাটির অবতারণা করেন, যা তাবরীর তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এই অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই আয়াত অবতরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা যেন মহানবী (সা.)-এর মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করেছেন এবং হযরত উমর (রা.)'র সিদ্ধান্তকেই সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি ভ্রান্ত। প্রথমত, তখনও পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এরূপ কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নি যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছাড়া যাবে না; তাই মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি কোন আপত্তি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এর পূর্বে নাখলায় যে দু'জন বন্দী হয়েছিল, তাদেরকেও মহানবী (সা.) মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন; তখন আল্লাহ্ তা'লা মোটেও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নি। তৃতীয়ত, এই আয়াতের মাত্র দুই আয়াত পরেই আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও মুক্তিপণ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছেন এবং সেটিকে বৈধ ও পবিত্র আখ্যা দিয়েছেন। এটি হতেই পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মুক্তিপণ গ্রহণে অসন্তুষ্ট হবেন, আবার সেই মুক্তিপণের অর্থকেই 'হালাল ও তৈয়্যব' (বৈধ ও পবিত্র) আখ্যা দিবেন! প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা ইমাম রাযী এবং বিখ্যাত জীবনীকারক আল্লামা শিবলী নু'মানীও হযরত মুসলেহ্ মওউদ

(রা.)-এর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। হুযূর (আই.) সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) রচিত 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তক থেকেও এই ঘটনাটির বিবরণ উপস্থাপন করেন।

হযরত হাফসা (রা.)'র সাথে মহানবী (সা.)-এর বিবাহের ঘটনাটিও হুযূর (আই.) তুলে ধরেন। হযরত হাফসা (রা.)'র স্বামী খুনায়স বিন হুযায়ফা আস-সাহমী (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উমর (রা.) গিয়ে হযরত উসমান (রা.)'র কাছে হযরত হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন; উসমান (রা.) চিন্তা করার জন্য কিছুদিন সময় নেন এবং পরবর্তীতে জানিয়ে দেন যে, আপাতত তিনি বিয়ে করছেন না। হযরত উমর (রা.) তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে গিয়ে প্রস্তাব দেন, কিন্তু আবু বকর (রা.) তাকে কোন উত্তর দেন নি। হযরত আবু বকর (রা.)'র এরূপ মৌনতায় হযরত উমর (রা.) বেশি কষ্ট পান। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) নিজেই হযরত উমর (রা.)'র কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত হাফসা (রা.)'র বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)'র কাছে গিয়ে নিজের মৌনতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি হযরত উমর (রা.)'র প্রস্তাব পাওয়ার পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন। যেহেতু তা মহানবী (সা.) গোপন রেখেছিলেন, তাই আবু বকর (রা.) সেটি উমরের কাছে প্রকাশ করেন নি। এক বর্ণনা থেকে এটিও জানা যায়, যখন হযরত উসমান ও আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)'কে ফিরিয়ে দেন, তখন উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে দুঃখের সাথে একথা জানান। মহানবী (সা.) তখন বলেছিলেন, **'উমর, চিন্তা করো না। আল্লাহ্ চাইলে হাফসা আবু বকর ও উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামী এবং উসমান হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী লাভ করবে।'** ৩য় হিজরির শাবান মাসে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

উহুদের যুদ্ধের দিন যখন অরক্ষিত গিরিপথ ধরে খালিদ বিন ওয়ালীদের উপর্যুপরি আক্রমণে মুসলমানদের বিজয় সাময়িক পরাজয়ে পরিণত হয় এবং ইবনে কামিয়া হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'কে হত্যা করে শোরগোল শুরু করে যে, সে মহানবী (সা.) কে হত্যা করেছে, তখন সাহাবীদের মাঝে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। মুসলমানদের জন্য তা চরম কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল। বেশ কয়েকজন সাহাবী হতাশ ও দুঃখ-ভারক্রান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেন ও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান; যদিও তাদের সংখ্যা অনেক অল্প ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে পবিত্র কুরআনে তাদেরকে ক্ষমা করার ঘোষণাও দেন। দ্বিতীয় একদল সাহাবী ছিলেন যারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে না গেলেও মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ভুল সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের একপাশে বসে কাঁদছিলেন; হযরত উমর (রা.)ও এই দলে ছিলেন। তৃতীয় একদল সাহাবী ছিলেন যারা এই খবর শুনে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেয়াকে যৌক্তিক মনে করেন এবং বুক চিতিয়ে যুদ্ধ করে অনেকে শহীদও হন। হযরত আনাস বিন নাযর আনসারী (রা.)ও এমনই একজন ছিলেন; তিনি যখন হযরত উমর (রা.)'র কাছ থেকে মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের গুজব শোনেন, তখন এই বলে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, **'রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেখানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন, সেখানে বেঁচে থেকে জীবনের আর আনন্দই বা কী?'** তিনি প্রবল বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হন এবং যুদ্ধ শেষে দেখা যায়, তার দেহে আশিটির অধিক আঘাত রয়েছে এবং তার লাশকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল যে, তাকে চেনাই দুষ্কর। মহানবী (সা.) কয়েকজন সাহাবীসহ একটি উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন, খালিদ বিন ওয়ালীদ একদল কাফিরসহ সেখানে আক্রমণ করেন। তখন হযরত উমর (রা.) একদল মুহাজিরসহ তাদের আক্রমণ করেন

ও মেরে তাদের তাড়িয়ে দেন। এক বর্ণনামতে আবু সুফিয়ান সেই উপত্যকার কাছে গিয়ে একে একে জানতে চায় যে, মুহাম্মদ (সা.), আবু বকর ও উমর (রা.) জীবিত আছেন কি-না। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সাহাবীরা নিশ্চুপ ছিলেন। কিন্তু যখন আবু সুফিয়ান উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, তারা মহানবী (সা.) ও আবু বকর, উমর প্রমুখকে হত্যা করে ফেলেছে, তখন হযরত উমর উত্তর দিয়ে বসেন যে, তারা সবাই জীবিত। আবু সুফিয়ান এরপর উচ্চস্বরে 'ওলো হুবল' ধ্বনি দেয় অর্থাৎ 'হুবল প্রতিমার মর্যাদা উচ্চ হোক'। মহানবী (সা.) এতক্ষণ মুসলমানদের মঙ্গলার্থে নিশ্চুপ ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ওপর আক্রমণ দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন আর মুসলমানদের এর প্রত্যুত্তর দিতে বলেন- **'আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্ল'** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মর্যাদাই সর্বোচ্চ এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত। আবু সুফিয়ান তখন বলে ওঠেন, 'আমাদের তো হুবল আছে, তোমাদের তো হুবল নেই!' রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের উত্তর শিখিয়ে দেন, **'আল্লাহু মাওলানা ওয়ালা মাওলা লাকুম'**; আমাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ্, আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই!

মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরেন, তখন মুনাফিক ও ইহুদীরা খুব আনন্দ প্রকাশ করছিল। হযরত উমর (রা.) তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চান। মহানবী (সা.) বলেন, **'তারা কি এই সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল?'** হযরত উমর (রা.) বলেন, তারা তো এই সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু তা দেয় তরবারির ভয়ে! এখন তো তাদের মনের অবস্থা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে! কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, **'আমাকে সেই ব্যক্তির প্রাণনাশে নিষেধ করা হয়েছে যে এরূপ সাক্ষ্য দেয়;' অর্থাৎ যারা কলেমা পাঠ করে।** হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পুনরায় দোয়ার কথা স্মরণ করান; বিগত খুতবায় ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য যে দোয়ার আহ্বান করেছিলেন তা আজও পুনরায় স্মরণ করান এবং বলেন, যদিও এখন যুদ্ধ-বিরতি চলছে, কিন্তু ইতিহাস বলে যে, কিছুদিন পরপরই কোন না কোন অজুহাতে শত্রুরা তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের ওপর অত্যাচার চালাতেই থাকে; আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন, তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা লাভ করুক এবং আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম নেতৃত্বও দান করুন। অনুরূপভাবে পৃথিবীর যেসব স্থানে আহমদীরা নিপীড়িত অবস্থায় রয়েছে, বিশেষত পাকিস্তানে— তাদের জন্যও হুযূর দোয়া করতে বলেন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রাখেন। (আমীন)

এরপর হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন ও গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথম জানাযা কাদিয়ানের নায়েব নাযের ইশায়াত কুরাইশী মুহাম্মদ ফযলুল্লাহ্ সাহেবের। তার পিতার নানা ও মায়ের দাদা হযরত মুন্সী মেহেরুদ্দীন সাহেব (রা.) বংশের প্রথম আহমদী ও মসীহ্ মওউদ (আ)-এর সাহাবী ছিলেন। কুরাইশী ফযলুল্লাহ্ সাহেব জামেয়া পাস করার পর ২৩ বছরের অধিক সময় জামেয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকতা করেন; শিক্ষক হিসেবে তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও সময়ানুবর্তী ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী ছিলেন। সর্বমোট ৩৭ বছর ৭ মাস তিনি জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইশায়াত বিভাগেও তিনি অসাধারণ সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। দ্বিতীয় জানাযা হল, **কাদিয়ানের মুরব্বী সিলসিলা সৈয়দ বশীরুদ্দীন আহমদ সাহেবের**। তৃতীয় হলেন, **কাদিয়ানের ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী বাশারাত আহমদ হায়দার** সাহেব; তিনি মরহুম আব্দুল করীম সাহেবের পৌত্র ছিলেন, যাকে কুকুরে কামড়েছিল এবং মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর দোয়ায় তিনি অলৌকিকভাবে জলাতঙ্ক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। চতুর্থ হলেন, পেশোয়ারের জেলা আমীর মোকাররম ডা. মুহাম্মদ আলী খান সাহেব; তিনি ছাত্রাবস্থায় নিজেই বয়আত করেন এবং চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও আহমদীয়াতে অবিচল থাকেন। তার পিতামাতাও তার অনেক বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। পঞ্চম হলেন, রাবওয়ার মোকাররম মুহাম্মদ রাফি খান শাহযাদা সাহেব, ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ার আইয়ায ইউনুস সাহেব, সপ্তম মিয়া তাহের আহমদ সাহেব, অষ্টম যুক্তরাজ্যের রফিক আফতাব সাহেব, নবম যুক্তরাজ্য জামেয়ার শিক্ষক মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী মোহতরমা যানিনা আখতার সাহেবা, দশম হাফেয মুহাম্মদ আকরাম সাহেব, একাদশ কাদিয়ানের দরবেশ চৌধুরী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র চৌধুরী নূর আহমদ নাসের সাহেব এবং সবশেষ মোকাররম মাহমুদ আহমদ মিনহায সাহেব। হুযূর তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের রূহের মাগফিরাতের জন্য ও পদমর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]